গানে গানে মুক্তিযুদ্ধ ঃ রথীন্দ্রনাথ রায়

'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, আমরা কজন নবীন মাঝি...' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সেই নবীন মাঝিদেরই একজন ছিলেন রথীন্দ্রনাথ রায়। বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী তিনি। যেমন লোকগানে, তেমনই গণসঙ্গীতে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার ভরাট কন্ঠের গান মুক্তিপাগল বাঙালির হৃদয়ে আবেগের ঝড় তুলতো। সেই দুর্বার সংগ্রামের দিনগুলোতে গানে গানে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুঃসাহসী এক কণ্ঠযোদ্ধা। প্রমাণ করেছিলেন কখনো মেশিনগানের চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে সঙ্গীত। গ্রন্থণা ও অনুলিখন ঃ ইখতিয়ার উদ্দিন।

রথীন্দ্রনাথ রায় ঃ নীলফামারী হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাস করার পর ১৯৬৬ সালে ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। ঐ সময়টাতেই ছাত্র-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। ঢাকা কলেজে খুব কড়াকড়ি ছিল। ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে দেওয়া হতো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রনেতারা মাঝে মাঝে এসে আমাদের ক্লাস থেকে বের করার চেষ্টা করতেন। একদিন রাজ্জাক ভাইও (আব্দুর রাজ্জাক, বর্তমানে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য) এসেছিলেন। তখনই তাকে প্রথম দেখি। '৬৮ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হই। '৬৮, '৬৯, '৭০- এই সময়ে আন্দোলনটা একেবারে তুঙ্গে। যেহেতু আমি একজন শিল্পী, তাই ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার সম্পৃক্তি ছিলই। এভাবেই গণসঙ্গীত গাইতে শুরু করি। সেই সময় শেখ লুৎফুর রহমান, সুখেন্দু চক্রবর্তী, আব্দুল লতিফ, অজিত রায়- এদের সুর করা অনেক গণসঙ্গীত পরিবেশন করি এবং তাদের সান্নিধ্যে আসি। এরাই তো এদেশে গণসঙ্গীতের পুরোধা। এভাবেই গান গাইতে গাইতেই ধীরে ধীরে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। আসাদ যেদিন শহীদ হন ঢাকা মেডিকেলের সামনে- ওই মিছিলে আমিও ছিলাম। '৭০-এর নির্বাচনের সময় আমি থার্ড ইয়ারে উঠেছি। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর ঘটনাবলী দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। সে সব ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চূড়ান্ত পরিণতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যাই আমিও। ২৫ মার্চ ক্র্যাক ডাউন হলো। আমরা থাকতাম পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে। শাঁখারীবাজার এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ কারণে আমরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাই। আমরা যে বাসায় ভাড়া থাকতাম ঐ বাসার অন্য ভাড়াটিয়া পরিবার ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। তাদের বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে। ২৯ মার্চ আমরাও তাদের সঙ্গে বিক্রমপুর চলে যাই। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয়ে গেলো। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে- এইচএমভির ঢাকা চিফ ছিলেন কলিম শরাফী। এ সময় কলিম শরাফী বঙ্গবন্ধুর ওপরে একটি ফোর এক্সটেন্ডেড প্লে (৪টি গানের ডিস্ক) তৈরি করেন। এর মধ্যে ২টি গান ছিল আমার একক কণ্ঠে এবং ২টি ছিল সমবেত কণ্ঠে। হঠাৎ একদিন শুনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমার গান বাজছে। তখনই ভাবলাম, আমাকে তো তাহলে ওখানেই যেতে হয়। কিন্তু আমি সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোথায় তাও জানতাম না। তবু সিদ্ধান্ত নিলাম, যেতেই হবে। এপ্রিলের শেষ দিকে ৩ বন্ধুকে নিয়ে বাবা-মাকে না জানিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমরা থাকতাম বিক্রমপুরের বালিগাঁওয়ে। ওখান থেকে ৩ জন যাত্রা শুরু করলাম আগরতলার উদ্দেশে। অনেক কষ্টে নানা ভয়ভীতি ও বাধা অতিক্রম করে গিয়ে পৌঁছলাম সীমান্তের ওপারে সোনামুড়ায়। পথে রণজিৎ নামে একটি ছেলে আমাদের অভাবিত সহযেগিতা করে। সোনামুড়ায় দেখা হলো বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সুভাষ দত্তের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'চলো তোমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যাবো।' আমি বললাম, 'কাকু, আমি আজ ফিরে যাবো। কয়েক দিনের মধ্যেই বাবা-মাকে নিয়ে আবার আসবো।' কাকু বললেন, 'ক্ষেপেছো, এ অবস্থায় ফিরে যাওয়া, আবার আসা- এ তো অসম্ভব।' আমি বললাম, তবুও আমাকে যেতেই হবে। যাই হোক, ফিরে এসে বাবা-মাকে নিয়ে আবার ভারতে গেলাম। তাদের শরণার্থী শিবিরে রেখে মে'র শেষ দিকে মাত্র ১ টাকা পকেটে নিয়ে জীবনের প্রথম আমি পা রাখলাম কলকাতার রাস্তায়। ঐদিনই গিয়ে হাজির হলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। গিয়ে দেখি

সেখানে আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদরা আছেন। পরিচয় হলো মান্না হকের সঙ্গেও। দোতলা বাড়িতে ওপর তলায় স্থাপন করা হয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। কামাল লোহানী আমাকে ডেকে বললেন, শোন, কোথাও যাবি না। এখানে থাকা-খাওয়া ফ্রি। আর হাত-খরচা মাসে ৫০ টাকা। ৩টি কক্ষের একটিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও। একটিতে অফিস আর একটির মেঝেতে বিছানা পেতে আমরা ঘুমাতাম। আমার কোনো বিছানাপত্র ছিল না। দীর্ঘ ভ্রমণে শরীর ক্লান্ত। আব্দুল জব্বার ও আপেল মাহমুদ বললেন, আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। তুমি যে কারো বিছানা পেতে খানিক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। ঐ বাড়িরই নিচতলায় থাকতেন পারভীন হোসেন ও তার স্বামী টি হোসেন। পারভীন হোসেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি খবর পড়তেন। প্রথম দিনেই উনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। তিনি আমাকে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানেই বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকালে আপেল মাহমুদ আমাকে ডেকে তুললো। বললো, 'মামু, একটা গান লিখেছি। তুই যদি একটু টান দিস তাহলেই সুর হয়ে যাবে। এটাই সেই বিখ্যাত গান 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে।' এটাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমার প্রথম গান। আমি, আপেল ও মোতাহার সমবেত কণ্ঠে এই গানটি গেয়েছিলাম। এছাড়া 'চাষাদের মুটেদের মজুরের', 'তারা এ দেশের সবুজ ধানের শীষে', 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাটি', 'ও পরানের বন্ধুরে বলবো কি তোরে', 'ও বগিলারে ক্যান বা আলু বাংলাদেশে' প্রভৃতি অনেক গান গেয়েছি। সকল কোরাস গানেই আমি থাকতাম লিডিং আর্টিস্ট। এভাবেই গানে গানে চলছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। তারপর ১৬ ডিসেম্বর এলো বহু কাঙ্ক্ষিত বিজয়। দেশ শত্রুমুক্ত হয়ে গেলো। আমরা ফিরে এলাম স্বাধীন দেশে। বুকের ভেতর তখন অনেক স্বপ্ন। কিন্তু সে সব স্বপ্নের অনেক কিছুই আজো অপূর্ণ রয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনেক শিল্পীকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন তাদেরকে বীরোত্তম, বীরবিক্রম খেতাব দেওয়া হয়েছে। এই সম্মান তাদের প্রাপ্য। আমরা যুদ্ধ করেছি গানে গানে, সুরে সুরে। সেটা কি মুক্তিযুদ্ধ নয়? তাহলে আমাদের সম্মান জানানোর কোনো উদ্যোগ তো দেখলাম না।